তিন শূন্যের পৃথিবী এবং শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর

শায়খ আহমদ

শায়খ আহমদ

প্রকাশ: ০৯ জানুয়ারি ২০২৫ | ০০:৪৯

- অ +

তিন শূন্যের ধারণা শুরুতেই বোঝা দরকার। নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্ববাসীর সামনে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশের টেকসই উন্নয়নে ‘থ্রি জিরো’ বা ‘তিন শূন্য’ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব এবং শূন্য নিট কার্বন নিঃসরণে ‘তিন শূন্য’তত্ত্ব কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। চরম দারিদ্র্য, বেকারত্বের

ঊর্ধ্বগতি এবং পরিবেশ বিপর্যয় রুখতে হলে এখন একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রয়োজন। আগামী শতাব্দীর এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যর্থ হলে বিশ্ব আরও বেশি অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে।

শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন বেকারত্ব দূর করার প্রধানতম হাতিয়ার বলে মনে করা হয়। কিন্তু আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সুশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির বদলে এক বিশাল অদক্ষ কিন্তু সনদধারী বেকার শ্রেণি সৃষ্টি করে চলেছে। অন্যদিকে মানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি পূরণে বিদেশি কর্মী নিয়োগের ফলে প্রতিবছর দেশ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। একদিকে অদক্ষ বিশাল বেকার শ্রেণির চাপ, অন্যদিকে দক্ষ কর্মীর অভাব- এই বিপরীতমুখী অবস্থান বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অদূরদর্শিতা, সমন্বয়হীনতা ও অব্যবস্থাপনার চিত্র প্রকটভাবে তুলে ধরে।

বাংলাদেশ বর্তমানে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড উপভোগ করছে। অর্থাৎ দেশে এখন মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি সংখ্যক কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী রয়েছে। কিন্তু এই সুযোগ বেশি দিন থাকবে না, যেমনটি এখন নেই জাপান, যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের অনেক দেশে। দেশের প্রতিটি কর্মক্ষম জনশক্তিকে কাজে লাগানোর এখনই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এ জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্মমুখী, যুগোপযোগী এবং টেকসই করার জন্য ব্যাপক সংস্কার দরকার।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যেন দেশের প্রত্যেক নাগরিক তার মেধা, দক্ষতা ও শারীরিক সক্ষমতা অনুসারে পছন্দমতো পেশায় নিয়োজিত হতে পারে। এ জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে ডক্টরেট পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের কিছু প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক থেকে ডক্টরেট পর্যন্ত ১০টি স্তরের প্রতিটির শিক্ষাজীবন শেষে জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে।

আবহমানকাল থেকে আমাদের দেশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা মসজিদ-মন্দিরে কোমলমতি শিশুদের বুনিয়াদি শিক্ষা দেওয়ার প্রচলন ছিল। শিশুকালে প্রাপ্ত চরিত্র, মূল্যবোধ ও মানবতার শিক্ষা জীবনকাল শিক্ষার্থীরা ধারণ ও লালন করে থাকে। এই বুনিয়াদি শিক্ষার জন্যই সমাজে অন্যায়-অবিচার অনেক কম ছিল; সামাজিক সম্প্রতি ছিল অনেক। কিন্তু আজকাল এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অনেক সীমিত হয়ে এসেছে। ফলে সামাজিক মূল্যবোধ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে। আমাদের সংস্কৃতির এই অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

অষ্টম শ্রেণি সমাপনীতে মাদ্রাসা ও বাংলা মিডিয়াম শিক্ষার্থীদের জন্য জেডিসি বা জেএসসি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। এই পরীক্ষা একজন শিক্ষার্থীর জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা হবে এবং এই সনদ পরবর্তী শিক্ষা ও কর্মজীবনে ব্যবহার করা যাবে। যারা জেএসসি বা জেডিসি পরীক্ষায় শতকরা ৪০ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হবেন তারাই কেবল সাধারণ, কারিগরি বা মাদ্রাসায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। যারা কম নম্বর পাবে তারা সরাসরি কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারবে।

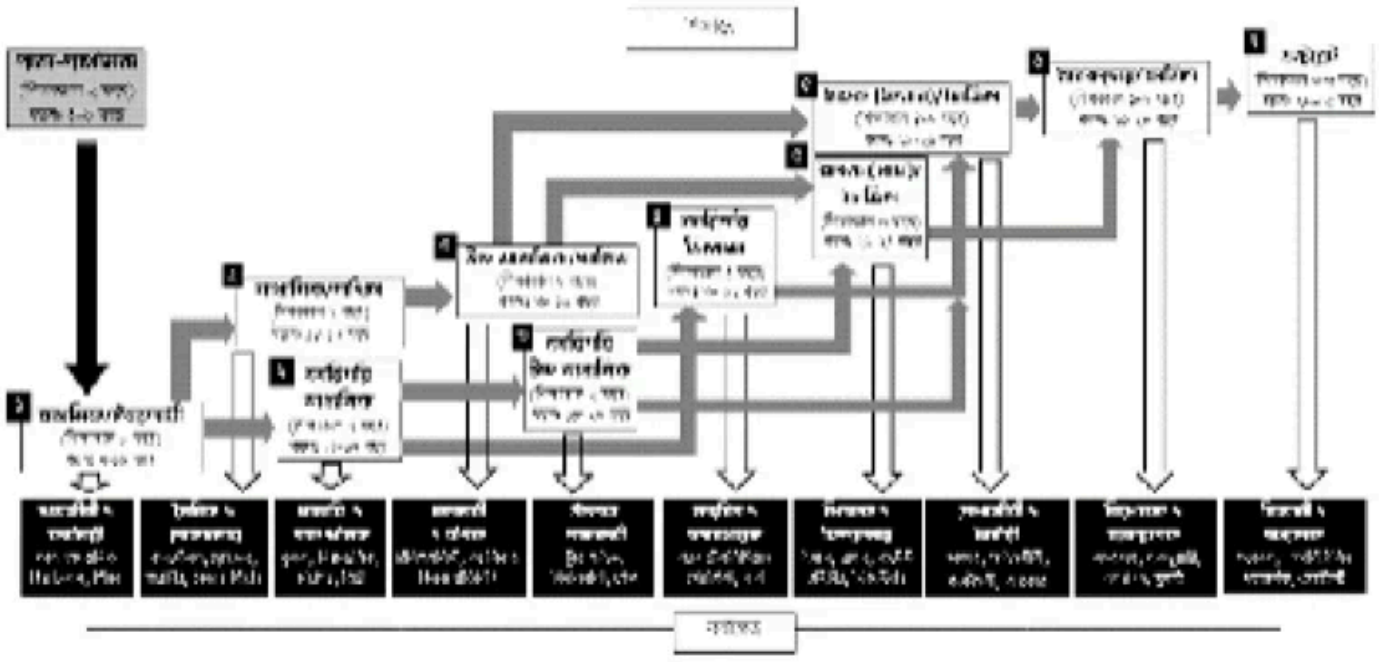

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতাভিত্তিক কর্মক্ষেত্র

দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে কারিগরি শিক্ষা ধারায় সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্ত করতে হবে। যারা দুই বছর মাধ্যমিক বা আরও দুই বছর উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ালেখা সমাপ্ত করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চায়, তাদের জন্য থাকবে কারিগরি শিক্ষা। ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও কারিগরি শিক্ষা নিতে পারবে। গ্রামাঞ্চলের কারিগরি বিদ্যালয়ে কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীকে ভর্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। উপজেলা, জেলা ও মহানগরের কারিগরি বিদ্যালয়ে শিল্প ও পরিষেবাসংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চতর কারিগরি দক্ষতার জন্য এসএসসি বা দাখিল পাস করে পলিটেকনিক কলেজে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা সম্পন্ন করা যাবে। তবে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের এসএসসি বা দাখিল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫০ নম্বর পেতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠান যন্ত্রবিদ ও তত্ত্বাবধায়ক তৈরি করবে। দক্ষ ও উচ্চতর দক্ষ কর্মীরা উচ্চ বেতনে বিদেশের কর্মবাজারে যোগদান করে দেশের রেমিট্যান্স আয় বৃদ্ধি করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

দেশে হাজারখানেক ডিগ্রি কলেজ রয়েছে। এসব কলেজে কলা, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদে তিন বছর মেয়াদি স্নাতক (পাস) সম্পন্ন করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরীক্ষা নিয়ে সনদ দেওয়া হয়। এই ডিগ্রি কলেজগুলোতে যদি তিন বছর মেয়াদি কর্মমুখী বিভিন্ন ধরনের ফ্রিল্যান্সিং কোর্স চালু করা হয়, তবে জাতি বেশি উপকৃত হবে। উচ্চশিক্ষিত যুবসমাজ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে এনে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে সাহায্য করতে পারবে। তবে শিক্ষার মান ধরে রাখতে ডিগ্রি (পাস) কোর্সে ভর্তির জন্য দাখিল বা এসএসসি এবং আলিম বা এইচএসসিতে শতকরা ৫০ নম্বর বাধ্যতামূলক করা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে অনেক ডিগ্রি (সম্মান) কোর্স চালু আছে, যেগুলো জীবন ও কর্মোপযোগী নয়। উচ্চশিক্ষিত বেকার সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই কোর্সগুলোর ভূমিকা ব্যাপক। সুতরাং এই কোর্সগুলো বন্ধ করে দেশের বিভিন্ন কলেজে কর্মমুখী বিভিন্ন ধরনের স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু করলে উচ্চদক্ষ কর্মী সৃষ্টি হবে এবং শিক্ষিত বেকারের হার কমে আসবে। আমাদের প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসা, আইন, টেক্সটাইল, নার্সিং, ফাইন আর্টস, মেরিটাইম ও এভিয়েশন কলেজগুলোর মানের ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। এসব পেশাদারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশ্বমানের না হলে বিদেশিদের ওপর আমাদের নির্ভরতা কমবে না এবং বিদেশি কর্মী নিয়োগও বন্ধ হবে না। দাখিল বা এসএসসি এবং আলিম বা এইচএসসিতে ৬০ শতাংশ নম্বর না পেলে কোনো শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় হবে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিদ্যাপীঠ। প্রকৃত মেধাবীরাই কেবল উচ্চ মাধ্যমিক (ন্যূনতম ৬০ নম্বর) ও ভর্তি পরীক্ষার ফলের ওপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে। গবেষণা, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং শিক্ষামানের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে নিজেদের একটি র‍্যাংকিং পদ্ধতি চালু করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এই কাজটি প্রতিবছর একবার করবে।

বিদ্যানুরাগী কোনো শিক্ষার্থী যদি স্বাস্থ্যগত, পারিবারিক, আর্থিক, পেশাগত বা কম নম্বরের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা নিতে সক্ষম না হয়, তাদের জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার তো সব সময়ই খোলা। এসএসসি থেকে ডক্টরেট পর্যন্ত যে কোনো স্তরের শিক্ষা দূরশিক্ষণের মাধ্যমে তারা নিতে পারবে। বয়স কিংবা সময় তাদের জন্য কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো দরকার। তাহলে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আসতে অনুপ্রাণিত হবে। মানুষ গড়ার কারিগরদের সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তাদের জবাবদিহির মধ্যে আনতে হবে।

দেশে দক্ষ জনশক্তি ও সুনাগরিক তৈরি করতে শিক্ষায় কমপক্ষে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। শিক্ষায় বিনিয়োগ থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে দীর্ঘ সময় লাগে; অনেক সময় একটি প্রজন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু শুরুটা এখনই করা প্রয়োজন। ‘তিন শূন্য’তত্ত্বের জনক বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এখন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবেন– এই প্রত্যাশা রইল।

ড. শায়খ আহমদ: সহকারী অধ্যাপক (অ্যাডজাংক্ট ফ্যাকাল্টি), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও লিড কনসালট্যান্ট, এক্সআরশিয়ালস